আরেক রকম ● অষ্টম বর্ষ সপ্তদশ সংখ্যা ● ১৬-৩০ নভেম্বর, ২০২০ ● ১-১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭

প্রবন্ধ

অতিপরিবাহিতাঃ এখনও একটি বিস্ময়

অনিন্দ্য সরকার

অতীতে অ্যালকেমিস্টদের (যারা সীসা কে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারত বলে কথিত) প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল এই যুগে অতিপরিবাহিতার (Superconductivity) প্রতি প্রায় ততটাই। একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার (Tc) নীচে কোনো বস্তুর রোধ শূন্য হয়ে যাবে (অতিপরিবাহী পদার্থের ধর্ম) এটা ভাবাই বিস্ময়ের এবং সেটাই বাস্তবে ঘটে কিছু বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে। একথা সুবিদিত যে আমাদের দেশে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ব্যবহারস্থল অবধি পৌঁছতে প্রায় এক ষষ্ঠাংশ শক্তি নষ্ট হয় বিদ্যুৎ পরিবহণে। এই ক্ষতি মূলত হয় বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের রোধ জনিত কারণে তাপশক্তি উদ্ভব এর জন্য। সেজন্য, রোধহীন পরিবাহীর আবিষ্কার শুনতে পেলে, শুধু বিজ্ঞানী কুল নন, আমরা সবাই পুলকিত হয়ে উঠি। মাত্র এক মাস আগে (১৪.১০.২০) নেচার পত্রিকায় আমেরিকান নজন বৈজ্ঞানিক দাবি করেন উচ্চচাপে বিশেষ কিছু যৌগ প্রায় ঘরের তাপমাত্রায় (room temperature, ২৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ৩০০ কেলভিন ধরা হয়) অতিপরিবাহিতা প্রদর্শন করেছে (২৮৮ কেলভিন বা ১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে)। বিজ্ঞানীরা যৌগটির নামোল্লখ করেছেন "Carbonaceous sulphur hydride"। ভারতবর্ষে সেই ১৯৯৪ সালে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে আবিষ্কৃত অতিপরিবাহীর ক্ষেত্রেও অল্পমাত্রায় কার্বনের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কয়েক বছর আগেও ব্রাজিল ও জার্মানীর বৈজ্ঞানিকরা দাবি করেছিলেন গ্রাফাইট নামক সুপরিচিত, কার্বন কেন্দ্রীক পদার্থে ৩৫০ কেলভিন (৭৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রাতেও অতিপরিবাহিতা লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৫ সালে নেচার পত্রিকাতেই হাইড্রোজেন সালফাইড নামক যৌগের ২০৩ কেলভিন (-৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রায় অতিপরিবাহিতার তথ্য প্রকাশিত হয়। সাম্প্রতিক অতীতে বিশ্বজুড়ে উপরিউক্ত যৌগগুলির ঘনিষ্ট গোত্রের পদার্থগুলিতে বিজ্ঞানীরা গবেষণায় মনোনিবেশ করেছিলেন, প্রথম বড়সড় সাফল্যের দাবি এল আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ থেকে। যদিও বছর দুয়েক আগে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা অতিপরিবাহিতা লক্ষ্য করার দাবি করেন, অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সোনা-রূপোর ধাতুকণার সংমিশ্রনের (composite) ক্ষেত্রে স্বাভাবিক চাপ ও ঘরের তাপমাত্রায়। বিতর্কিত এই দাবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে।

১৯০৯ সালে হল্যান্ডের (অধুনা নেদারল্যান্ডস) লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচ ক্যামারলিং ওনেস এবং তার সহযোগীরা প্রথম হিলিয়াম গ্যাস কে তরলীভূত করার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন| এই তাপমাত্রা গবেষণাগারে সৃষ্টি করা মানবজ্ঞানের এক বিরাট অগ্রগতি| আজ একশ বছরেরও পরে পৃথিবীতে খুব নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষাগারে হিলিয়াম গ্যাস কে তরল করার সুবিধা আছে| পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, মহাকাশ গবেষণা প্রতিটি ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নিম্ন তাপমাত্রা তৈরি, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা, পরিমাপ করা ইত্যাদির প্রযুক্তি| যাইহোক, ক্যামারলিং ওনেস তখন মূলত কাজ করছিলেন নিম্ন তাপমাত্রায় ধাতুর রোধ নির্ধারণের উপর| অদ্ভুতভাবে তিনি লক্ষ্য করেন সীসার (Pb) রোধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার (Tc = ৭.১৯ কেলভিন বা -২৬৫.৮১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) নিচে শূন্য হয়ে যাচ্ছে (চিত্র-১)। বারংবার পরিমাপ করেও একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন তারা। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা যখন ন্যানো কেলভিন (১০-৯ কেলভিন) তাপমাত্রা তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন এবং অনেক ধাতুর রোধ নির্ণয় করেছেন, ক্যামারলিং ওনেস এর পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ধাতুর রোধ প্রকৃতপক্ষে শূন্য কিনা এটা সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন। আমরা ধরে নিতে পারি সর্বনিম্ন যে রোধ তখন পরিমাপ করা যেত তারও কম হয়ে গেছিল সীসার রোধ। এটাই যথেষ্ট, কারণ অধিকাংশ সুপরিবাহী ধাতুর রোধ ওই তাপমাত্রায় (৭.১৯ কেলভিন) সীসার রোধের কয়েক হাজার গুণেরও বেশি। এটাও দেখা গেল সুপরিবাহী ধাতু সমূহ (যথা তামা, সোনা), যাদের ঘরের তাপমাত্রায় অতি অল্প রোধের কারণে যাদের তার বা সংযোগের কাজে লাগানো হয়, তারা কেউই অতিপরিবাহী নয়। বরং যাদের রোধ ঘরের তাপমাত্রায় অনেক বেশি (যথা সীসা, টিন), যাদের পরিবাহী বলে কোনো সম্মান ছিলো না (bad metals), তারাই অতিপরিবাহিতা প্রদর্শন করল।

চিত্র-১: অতিপরিবাহিতা বোঝানোর গুনগত চিত্র (Y অক্ষের স্কেলটি পরিমাপের জন্য নয়)। রোধাঙ্ককে সুবিধার্থে রোধও ধরতে পারেন। লক্ষ্যনীয়, সুপরিবাহী ধাতুর ক্ষেত্রে রোধ কখনই শূন্য হচ্ছে না।

পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যার জগতে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে এনে দিল বিজ্ঞানী ওনেস এর আবিষ্কার, কিন্তু তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের জগতে নতুন সংকটের সৃষ্টি হল। সেই সময় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পদার্থের বহু ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা হাজির করলেও এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না। কারণ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অনুমান অনুযায়ী শূন্য কেলভিন (পৌঁছনো যদিও অসম্ভব) তাপমাত্রাতেও কোনো পদার্থের রোধ শূন্য হতে পারে না, কারণ বিদ্যুৎবাহী কণা অল্প হলেও বাধাপ্রাপ্ত হবেই পদার্থের মধ্যে। অতিপরিবাহিতার ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। প্রয়োজন হল এক নতুন তাত্বিক বোঝাপড়ার, সেই প্রচেষ্টা জন্ম দিল পদার্থবিদ্যার এক অনাবিষ্কৃত অধ্যায়ের এবং অবশ্যই আবিষ্কর্তারা (বিজ্ঞানী জে বারডিন, এল কুপার এবং জে আর স্রাইফার) নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন (১৯৭২)। এই তত্ব বিসিএস তত্ব নামে জনপ্রিয়, প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে, এবং কাঠামোটি নির্মিত হয় ১৯৫২-১৯৫৩ সালে, যখন জে আর স্রাইফার স্নাতক স্তরের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং এল কুপার সদ্য স্নাতকোত্তর পাঠক্রম শেষ করেই এক বছরের মধ্যে পি.এইচ.ডি থিসিস জমা করেছেন। বিজ্ঞানী জে বারডিন অবশ্য তখনই খ্যাতনামা, ১৯৫৬ সালে একবার নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন। আগ্রহী পাঠকরা সময়ের ব্যবধান (১৯০৯-১৯৫৭)লক্ষ্য করুন, পরীক্ষামূলক আবিষ্কার ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার। একইসঙ্গে যতজন বৈজ্ঞানিক অতিপরিবাহিতা বিষয়ে গবেষণায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের তালিকাও নিচের সারণিতে দেওয়া হল বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য।

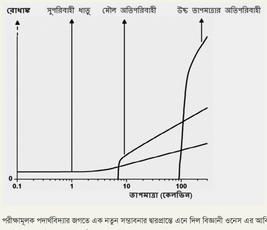

সারণি-১: অতিপরিবাহিতা বিষয়ে গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত বিজ্ঞানীদের তালিকা।

বিজ্ঞানীর নাম	প্রাপ্তির বছর
এইচ ক্যামারলিং ওনেস	১৯১৩
লেভ ডাভিডোভিচ ল্যান্ডাউ	১৯৬২
জে বারডিন, এল কুপার এবং জে আর স্রাইফার	১৯৭২
লিও এসাকি, আই গেইভার এবং বি ডি জোসেফসন	১৯৭৩
পি এল ক্যাপিৎজা	১৯৭৮
জি বেডনোর্জ এবং কে এ মূলার	১৯৮৭
ডি এম লি, ডি ডি ওশেরফ, আর সি রিচার্ডসন	১৯৯৬
এ এ অ্যব্রিকোসভ, ভি এল গিন্সবার্গ, এ জে লেগেট	২০০৩

প্রত্যেক বিজ্ঞানীর গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়াও পি জি দে জেনিস (নোবেল পুরস্কার - ১৯৯১), এফ ডব্লিউ মেইসনার, এফ লন্ডন, এইচ লন্ডন, এইচ ফ্রোলিখ, ই ম্যাক্সওয়েল, সি এ রেনল্ডস, এম টিঙ্কহ্যাম, পি ডব্লিউ অ্যান্ডারসন (নোবেল পুরস্কার - ১৯৭৭) সহ বহু প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অতিপরিবাহিতার পরীক্ষামূলক ও তাত্ত্বিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহিতা বিষয়ে গবেষণায় ভারতবর্ষের প্রথিতযশা অধ্যাপক সি.এন.আর রাও এর নাম বিজ্ঞানী মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত। যে সময়কালে উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহিতা আবিষ্কৃত হয় তখন বিজ্ঞানী রাও ও তার সহযোগীরা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে উক্ত বিষয়ে গবেষণায় প্রথম সারিতে ছিলেন। প্রত্যেকটি কাজ ধরে আলোচনা করতে হলে পদার্থবিদ্যার এমন সব পরিভাষা এবং তাদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন যা এই পরিসরে করা কিছুটা কঠিন।তাই বিস্তৃত আলোচনার বদলে সংক্ষিপ্ত রূপরেখাই প্রদান করা হয়েছে এখানে।

ভিন্ন হলেও প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর, বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ১৯৫২ সালে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে, অধ্যাপক অক্ষয়ানন্দ বসু (ও তার সহযোগীরা) হিলিয়াম গ্যাস কে তরল করতে সক্ষম হন। এই ঘটনা তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞান প্রযুক্তির ইতিহাসে এক বিশেষ গৌরবের দ্যোতক। স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নবলব্ধ স্বাধীনতা যে স্বনির্ভর ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাকে বাস্তবে রূপদান করতে অসাধ্য সাধনের পথে হেঁটেছিলেন বহু তরুণ বিজ্ঞানী, যারা বিদেশে আয়েশে উঁচু মানের গবেষণাগারে কাটিয়ে দিতে পারতেন সারা জীবন। দুঃখের বিষয়, গত ৭০ বছরে আমরা স্বনির্ভর ভারতবর্ষের স্বপ্নকে দুমড়ে, মুচড়ে বিদেশ থেকে কেনা হিলিয়াম তরলীকরণ যন্ত্রের উপর বেশি বেশি নির্ভর করে চলেছি, অকাতরে আমদানিকৃত রামন বীক্ষণ যন্ত্র বা অস্ত্রসম্ভার তার সঙ্গেই সাযুজ্যপূর্ণ।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পদার্থবিদ্যা/প্রযুক্তি বিভাগে অতিপরিবাহিতা বিষয়ে পরীক্ষামূলক ও তাত্ত্বিক গবেষণা চলে। আমরা জানি ইলেকট্রন একটি ফার্মি কণা (স্পিন = ১/২)। স্পিন হল মৌল কণার বৈশিষ্ট্যমূলক একটি রাশি। ইলেকট্রন যদি এই ফার্মি কণার মতো আচরণ করে, তাহলে কোনোভাবেই অতিপরিবাহিতা ব্যাখ্যা করা যাবে না। পরিবাহীর স্বল্পসংখ্যক ইলেকট্রন যদি একটি যুগ্ম (collective) অবস্থার সৃষ্টি করে যে একত্রে বোস কণার (স্পিন = ১) মতো আচরণ করে, সেক্ষেত্রে কণাগুলি বিনা বাধায় শক্তি পরিবহণ করতে পারে (যাকে আমরা তড়িৎ পরিবহণ বলে থাকি)। বিসিএস তত্ব দেখাচ্ছে ক্ষেত্রবিশেষে ইলেকট্রন গুলি পদার্থের অভ্যন্তরে এরকম আচরণ করতে পারে। এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা কারণ দুটি সম আধানের বিকর্ষণের পরিবর্তে যৌথ আচরণ একেবারেই অস্বাভাবিক। শুধু দুটি ইলেকট্রনের আচরণ নয়, পদার্থের অভ্যন্তরীন গঠন এক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। এখানেই পূর্বে উল্লিখিত উচ্চচাপের বিশেষ ভূমিকা। যাইহোক, বিসিএস তত্ত্ব প্রথম সুসংহত তত্ত্ব যা অতিপরিবাহিতাকে ব্যাখ্যা করে। তথাপি, এই তথ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ যে Tc অনুমান করা যায় তা হল ~ ১৩ কেলভিন। কিন্তু ১৯৮৬ সালে জি বেডনোর্জ এবং কে এ মূলার পরীক্ষামূলক (আই বি এম, জুরিখ গবেষণাগার) ভাবে নতুন পদার্থগোষ্ঠীর আবিষ্কার ঘোষণা করেন যাদের কয়েকটি ৭৭ কেলভিন (-১৯৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) তাপমাত্রার উপরে অতিপরিবাহিতা প্রদর্শন করে। এদেরকে উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহী (high temperature superconductor) বলা হয়ে থাকে (চিত্র-১)। ৭৭ কেলভিন তাপমাত্রা উল্লেখের কারণ এটি তরল নাইট্রোজেন এর বাস্পীভূত হওয়ার তাপমাত্রা। প্রযুক্তিগতভাবে এই তাপমাত্রা অর্জন করা অনেক সহজ। তেমনই হিলিয়ামের তুলনায় নাইট্রোজেন অনেক প্রাকৃতিকভবে সহজলভ্য। উদাহরণস্বরূপ, ভারতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি গবেষণাগারে হিলিয়ামকে তরলীকৃত করা হয় সেখানে কলকাতাতেই শ'খানেক নাইট্রোজেন তরলীকৃত করার যন্ত্র আছে। ফলত, পরীক্ষামূলক অতিপরিবাহিতার ক্ষেত্রে আবার নতুন সম্ভাবনা ও উন্মাদনা আসে। পরপর অনেক যৌগ আাবিষ্কৃত হয় যারা ১০০ কেলভিন এরও উপরে অতিপরিবাহী হয়ে ওঠে। আবিষ্কারের নেশা বিজ্ঞানী কুলকে এমন পেয়ে বসেছিল যে কলকাতায় তখন (১৯৮৭-১৯৯০) বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেকদিন নতুন কোন অতিপরিবাহী পদার্থ আবিষ্কার হল তার তালিকা টাঙানো হত।

আমরা যখন ১৯৯৭ সালে এই গবেষণায় যুক্ত হই তখনও এটা ভাবা হতো যে ঘরের তাপমাত্রায় রোধহীন অতিপরিবাহী আবিষ্কার হল বলে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। আরও সমস্যা হল এই নতুন পদার্থগুলি ধাতু নয়, ভঙ্গুর সিরামিক প্রকৃতির। এইসব পদার্থ দিয়ে তার তৈরি অসম্ভব যা বিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়| চেষ্টা করা হয়েছিল তামার তারের মধ্যে এই নতুন পরিবাহীকে বসিয়ে (embed) টেপ জাতীয় পরিবাহী বানানোর, যা কার্যকরী হতে পারে| সেক্ষেত্রে টেপটিকে তরল নাইট্রোজেন এ ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং রোধহীন তড়িৎ পরিবহণ সম্ভব। এভাবে আমেরিকার কোনো কোনো শহরে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শক্তির ব্যয় খুবই কম। শক্তিক্ষয় ততটুকুই যতটা তরল নাইট্রোজেন বাষ্পীভূত হচ্ছে তাকে আবার তরল করার জন্য প্রয়োজন, যা অতি সামান্য। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে বাধাহীন বিদ্যুৎ পরিবহণের মাধ্যমে অতিপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ৭ টেসলা চৌম্বক ক্ষেত্র (বেশ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র) তৈরি করে তা চালু রাখতে খরচ অতি নগন্য (বাস্পীভূত হিলিয়ামকে তরল করার জন্য প্রয়োজনীয়)। সেখানে তামার তার দিয়ে এই চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে প্রতি সেকেন্ডে শক্তির খরচ ২ মেগাজুল। কীভাবে এই বিপুল তাপশক্তিকে নিবারণ করা হয় তা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে গ্রেনোবেলে উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরির গবেষণাগারে। প্রয়োজনে তামার তারগুচ্ছের মধ্য দিয়ে নদীর ঠান্ডা জল প্রবাহিত করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ শক্তির ব্যবহার থেকে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। অতিপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার করলে যার কোনো সম্ভাবনাই নেই। তদুপরি একবার চালু হলে রোধহীন পরিবাহীর তড়িৎপ্রবাহ কমবে না কখনই। মাপার চেষ্টা করে দেখা গেছে, তড়িৎপ্রবাহ ১ শতাংশ কমতে যা সময় লাগবে তা মহাবিশ্বের বয়সের বেশি! স্বাভাবিকভাবে অতিপরিবাহীর তড়িৎপ্রবাহ জনিত চৌম্বক ক্ষেত্রের স্থায়িত্ব হবে অসাধারণ যা তামার পরিবাহী দ্বারা অর্জন করা অসম্ভব। মাত্র এক বছর আগে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অতি উচ্চমানের তড়িৎ উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে সর্ব্বোচ্চ ৪৫.৫ টেসলা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা গেছে, যা তামার তার (কুণ্ডলী) দিয়ে অসম্ভব। এরপর, সংক্ষেপে অতিপরিবাহিতা বিষয়ে বিজ্ঞানী বি ডি জোসেফসনের গবেষণা আলোচনা প্রয়োজন। চিত্র-২ এ দুটি উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহীর মাঝে একট ক্ষীণ অন্তরক পদার্থ (যার মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ অসম্ভব) রাখা হয়। দুটি উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহীর বদলে দুটি সুপরিবাহী ধাতু থাকলে কোনো তড়িৎপ্রবাহ হবে না। বিজ্ঞানী জোসেফসন দেখালেন উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহী (রোধশূন্য অবস্থায়)দুটির মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ সম্ভব মাঝে অন্তরক থাকলেও(!) এবং এই তড়িৎপ্রবাহ প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

চিত্র-২: বিজ্ঞানী জোসেফসনের আবিষ্কারের গুণগত চিত্রায়ন। অতিপরিবাহী দুটি Tc-র নীচের তাপমাত্রায় থাকতে হবে। এই অন্তরক সত্ত্বেও অতিপরিবাহী দুটির মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ সম্ভব। অন্তরকের জন্য ধাতুগুলি বৈদুতিকভবে বিচ্ছিন্ন।

যত কমই হোক এই তড়িৎপ্রবাহ মাপা সম্ভব হয়েছে। অতিপরিবাহী ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক্সের জগতে বস্তুত বিপ্লব সাধিত হল। এভাবে পদার্থগুলির গুণের উপর সর্বনিম্ন একটিমাত্র চৌম্বক বলরেখার প্রভাবও মাপা সম্ভব। একাধারে সর্ব্বোচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি, অন্যদিকে সর্ব্বনিম্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাপ উভয়ই অর্জিত হয়েছে উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহীর উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা। এই নতুন উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহীগুলির গুনাগুন কেমন হবে সে বিষয়ে পূর্বেই (১৯৫৭) পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানী, এ এ অ্যব্রিকোসভ, ভি এল গিন্সবার্গ প্রমুখ কিছু তাত্ত্বিক পূর্বানুমান করেছিলেন। পদার্থ ভিত্তিক একটি বিশেষ রাশি চিহ্নিত করে তারা অতিপরিবাহীগুলির শ্রেণিবিভাগ করেন। প্রথমটির চরিত্র মোটের উপর মৌল অতিপরিবাহীগুলির (সীসা, টিন প্রভৃতি) সাথে মিলে যায়। নতুন উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহীগুলি আবিষ্কার হওয়ার আগে তাদের কাজগুলিকে কিছুটা প্রতিভাবান অংকবিদের অপ্রয়োজনীয় কল্পনাবিলাস ভাবা হতো। কিছু ১৯৮৬ সালে উচ্চ তাপমাত্রার অতিপরিবাহী আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা গেল পদার্থগুলির গুনাগুণ আশ্চর্যভাবে সেই তাত্ত্বিক অনুমানসমূহের (শ্রেণিবিভাগের দ্বিতীয় ভাগের পদার্থগুলি) সাথে মিলে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই এই বিজ্ঞানীরা নোবেল পুরস্কার পান, তবে আবিষ্কারের ৪৬ বছর বাদে (২০০৩)। জ্ঞানঅন্বেষণে শুধু রুক্ষ যুক্তিবাদ নয়, সৃজনশীল কল্পনারও গুরূত্ত্ব অনেক।

একটি দুরূহ অথচ আকর্ষণীয় বিষয়কে কতটা সুপাঠ্য করে তোলা গেল তার বিচারের ভার পাঠকের। যেটা উল্লেখের প্রয়োজন, ঘরের তাপমাত্রায় অতিপরিবাহিতার আবিষ্কার এবং বিনা ব্যয়ে বিদ্যুৎ পরিবহণ এই গবেষণার একটি মাত্র দিক। বিশেষত, এমন সব যৌগে এই গুণ আবিষ্কৃত হচ্ছে তাদের তড়িৎ পরিবহনের উপযুক্ত করে ব্যবহারিক প্রয়োগ বেশ শ্রমসাধ্য। এখানেই প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা, প্রকৃতির শক্তিকে ব্যবহার করতে হলে প্রকৃতির নিয়ম মেনেই করতে হবে, ইচ্ছেমতো 'ভোগ' এর অধিকার প্রকৃতি দেয় না। জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে এই নিয়মকেই আমরা আবিষ্কার করার চেষ্টা করে থাকি। অন্যদিকে, অতিপরিবাহিতা বিষয়ে গবেষণা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে ও করে চলেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন ঘরের তাপমাত্রায় অতিপরিবাহিতার আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান, শক্তি গবেষণা (উৎস ও ব্যবহার সংক্রান্ত) এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতিসাধন করবে কয়েক বছরের মধ্যেই। আমরা আশা করতেই পারি ভারতবর্ষের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্ষে বর্ষে যে ছাত্রধারা শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের মধ্যেই কেউ আগামী দিনে ওনেস বা বারডিন বা অক্ষয়ানন্দ বসুর মত মহীরুহসম হয়ে উঠবে এবং তারা যে জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করবে, সমগ্র বিশ্ব সেই অমৃতের 'লভিবে ভাগ'।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ প্রবন্ধটির পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করার জন্য বিজ্ঞানী ডঃ ঊর্ধ স্যান্যাল বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। ডঃ ঋক চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সপ্তর্ষি পাল-কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

কপিরাইট © 2024 সমাজ চর্চা ট্রাস্ট। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।